হারানো ছাগল ও জনৈক চোখের ডাক্তার

সবুজ বিশ্বাস

ডাক্তারি প্রফেশনে যোগ দেবার পর সব ডাক্তারই জেনে যায় যে রোগীর চিকিৎসা ছাড়াও রোগীর মনের গোপন গহন থেকে যেসব প্রশ্ন উত্থিত হবে তার সহৃদয়, সহানুভূতিশীল উত্তর দিতে হবে। সে প্রশ্ন গুড লেংথ হতে পারে এবং পরপর ওয়াইড-ও আসতে পারে। আপনি ডাক্তার, আপনি ধৈর্য নিয়ে শুনবেন, উত্তর দেবেন। শেষ করার পর ওইএকই প্রশ্ন করতে পারেন তিনি। এতে মন খারাপ করার কিছু নেই। রোগীর প্রশ্ন শেষ হবার পর রোগীর স্ত্রী আলাদাভবে প্রশ্ন করবেন, কাকা করবেন। তারপর খুড়তুতো দাদা, যিনি সঙ্গে এসেছেন এবং সারাক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছিলেন ও ওই সময় চা খেতে গিয়েছিলেন তিনিও এসে প্রশ্ন করবেন। এরপর কিছু রোগী ডাক্তারের পরিচিত কাউকে পেয়ে যাবেন এবং তার মারফত ওই প্রায়ই একই প্রশ্ন সপ্তাহখানেক বাদে করবেন। এরপর কিছু রোগী ডাক্তারের পরিচিত কাউকে পেয়ে যাবেন এবং তার মারফত ওই একই প্রশ্ন সপ্তাহখানেক বাদে করবেন। তিনি এই প্রশ্ন আপনার সঙ্গে, একই বিয়ে বাড়িতে নিমন্ত্রিত হওয়ার সুবিধায় আইসক্রিম খেতে খেতে করে নিতে পারেন। সেটাও অসুবিধাজনক নয়। অন্তত ডাক্তার হিসেবে আপনি তাকে সেটা বুঝতে দেবেন না। তবে মুশকিলটা কি জানেন তো, অনেক সময় ওই অত্যন্ত পরিচিত আত্মীয় বা বন্ধুটি পেশেন্টের ভাল নামটি মনে করতে পারবেন না। আপনি দেখেছেন সন্দীপন মুখার্জি বা মালবিকা গুপ্তকে, কিন্তু রোগীর আত্মীয় ওকে জানে বুবুন বা টুম্পা নামে। এটাও স্বাভাবিক, কারণ আজকাল নিজেকে নিয়েই এত ব্যস্ত থাকতে হয় ওই লতায় পাতায় আত্মীয় বন্ধুর ভাল নাম কজন মনে রাখতে পারে। প্রশ্ন থাকবেই রোগীর, কারণ তিনি তো সুখে নেই আছেন অসুখে। ডাক্তারের নিজের অসুখ হলেও তিনি ডাক্তারের কাছে গেলে ভাবছেন প্রশ্ন করেন না। বরং যথেষ্টই করেন। সব ডাক্তারের দায়িত্ব তাই অসুখের পাশাপাশি রোগীকে ওই প্রশ্নের জাল থেকে মুক্ত করে নির্মল বাতাসে পৌঁছে দেওয়া। সেটা সম্ভবও। তবে কেউ কেউ প্রশ্নের মায়াজালে বারবার ফিরে যেতে চান। কেউ কেউ এদের ডাইটিং থামস বলেন। এদের ওই অসুবিধা কবিগুর কথায় বলা যায় নব নব ব্যাকুলতা জাগে দিবারাতে। সত্যিই তো। কিন্তু কবিগু নিজেই লিখেছেন তা ওঁরা জানেন নাবুঝা যায় আধো প্রেম, আধখানা মন--সমস্ত কে বুঝেছে কখন। কবিগু জানতেন, দূরদর্শী মহাপুষ লোক। কিন্তু সাধারণ মানুষকে কেঁচে গন্ডুষ করে পুরো মেডিসিন বই থেকে ডায়াবেটিসটা বুঝিয়ে দিতে হবে, যা জানতে আপনার বছর সাতেক লেগেছিল। এদের কেউ কেউ আসলে পঞ্জিকার পিছনের দিকে পাতার বিজ্ঞাপন দেখে সহজ অ্যালোপাথিক চিকিৎসা জাতীয় বই পড়ে থাকে। আসলে ওদের অনেকের উদ্দেশ্য থাকে যা পড়েছেন তা মিলছে কি না, আপনার কথার সঙ্গে।

প্রথম প্রশ্ন রোগীর 'কেন আমার হল?' ওই 'কেন'-র উত্তর দিতে পান বা না পান, আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান দিতে না পাক, আপনার রোগী পারবেন। স্বভাবতই তিনি আপনাকে সাহায্য করবার জন্য উসখুশ করবেন, তা আপনি চান বা না চান। আসলে সব পেশেন্টের মাঝে লুকিয়ে থাকে এক গোপন ডাক্তার। লিভারটা ডানদিকে না বাঁদিকে তা না জানলেও তিনি আপনাকে বলে দেবেন আসলে অসুখটা লিভার থেকেই হচ্ছে। কারণ, তার কাকার ওই লিভারের অসুখ থেকেই তো শেষমেশ কত সব ঝামেলা হয়েছিল এবং সব বড় বড় ডাক্তার পর্যন্ত ধরতে পারেননি। সব রোগীই তাই তাঁর রোগের ইতিহাস জানতে চাইলে বেশি খুশিই হন এবং মন খুলে বলতে চান। হ্যাঁ, শুধু মনে আছে একজনের কথা যিনি আমাকে বলেছিলেন আপনাকে যদি সব বলেই দিই তবে কনসাল্টেশন ফি জমা দিয়ে দেখাতে এলাম কোন দুঃখে? ওনাকে আমি অবশ্যই দেখিনি এবং বলেছিলাম মাফ করবেন, আমি ভেটারনারি ডাক্তার নই। আর একজন চোখের রোগীকে তার কোনো শারীরিক ব্যাধি আছে কি না জানতে চাইলে বলেছিলেন, 'না, না, তেমন কিছু প্রবলেম নেই। ওই একটু সুগার আছে, ইনসুলিন নিই দুবেলা, দু'বছর আগে একটা বাইপাস হয়েছিল, কিডনির ট্রাবলটা আছে, আর পেচ্ছাবটা আটকে আটকে যায়, হজমের আসুবিধা তো বয়স হলে হবেই আর ...।' আমি বললাম আরের আর দরকার নেই। পরে জেনেছিলাম ওই আরটা হল বছর খানেক আগে ডানদিকটা প্যারালিসিস হয়ে গিয়েছিল।

রোগীর ইতিহাস বেশ গুত্বপূর্ণ। ক্লিনিক্যাল মেডিসিনের গীতা। ডাঃ হাচিসনের বই-এর প্রথম পাতাতেই তা পরিস্কার লেখা আছে। কিন্তু যা হাচিসন সাহেব লেখেননি তা হল বাঙালি পেশেন্টের ইতিহাসের কথা। আর সেই বাঙালি পেশেন্ট এই দ্রাবিড় দেশের হাসপাতালে এসে এক পিস মাত্র বাঙালি ডাক্তার যদি পেয়ে যান তবে তো কথাই নেই। প্রথমেই শু করবেন, 'ভালই হল, আপনি তো বাঙালি, বাংলায় আমার ব্যাপারটা ভাল করে বুঝিয়ে বলা যাবে।' বাইরে তখন আমি জানি বসে বসে অধৈর্য হয়ে কিছু পেশেন্ট ব

াইরে ওয়েটিং হলে পাহারাদারের মতো টহল দিচ্ছেন, এবং মনে মনে তাদের কিছু কিছু গালাগালি দিচ্ছেন, এবং এই ওয়েটিং পিরিয়ডটা যদি আরও ঘন্টাখানেক বাড়ে তবে ওই গালাগালিগুলো মনে মনে না হয়ে প্রথমে স্বগতোক্তি পরে না বলাই ভাল কী হতে পারে। ইতিহাসের ব্যাপারে বাঙালিরা অকৃপণ। 'ইতিহাসে পাতিহাঁস' আর যে কেউ হোক বাঙালি পেশেন্ট নেভার। ঠিক আপনাকে 'ক্লু' ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করবেন। এদের কেউ কেউ যে কোনোদিন শরদিন্দু ব্যানার্জির 'ব্যোমকেশ' বা সত্যিজিৎ রায়ের 'ফেলুদা'-কে শুইয়ে দিতে পারেন। একজনের কথাই বলি। উনি বলেছিলেন, জানেন ওই একটা মাতি গাড়ি, লাল রঙের, ওর হেডলাইটের আলো টা সরাসরি পড়ল চোখটার উপর, আর ব্যাস তরপর থেকেই দৃষ্টিটা ঝাপসা হয়ে গেল। আমি অবশ্যই সেই মাতি গাড়ির প্লেট না ম্বারটা জিগ্যেস করিনি। কাণ ওনার চোখে রেটিনাতে ইনফেশন হয়েছিল, সেটা ওই হেডলাইটের আলো থেকে আসা অসম্ভব নয়। বাঙালি পেশেন্টরা ইতিহাসটা বেশ গুছিয়ে বলেন, মানে ভূমিকার উপর খুব জোর দেন। বৃদ্ধ এক ভদ্রলোকের কথা মনে আছে। গো বেচারি মানুষ। সু করেছিলেন এইভাবে। গত বছর সেদিন ছিল মহাষ্টমী, ২১ আশ্বিন। (এই চেন্নাই-এ বসে আমি আশ্বিন আর মহ াষ্টমীটা হাতড়াচ্ছি, ওপিডিতে তো পঞ্জিকা রাখা থাকে না। তবু আয়ুধ পুজোটাকে ধরে আইড়িয়া করে নিলাম মিড্ অক্টোবর)' বললাম, বলুন। খুশি হয়ে বললেন সেদিন অষ্টমী, সকালবেলা চণ্ডীপাঠ করেছি, বাড়িতে জামাই-মেয়ে এসেছে ইলিশ মাছ-টাছ, দই-মিষ্টি খেয়ে কথামৃতটা পড়বার চেষ্টা করছি। দেখি অক্ষরগুলো কেমন ঝাপসা লাগে ডান চোখটা দিয়ে। জামাইকে বললাম (জামাই -এর নাম সুবোধ), 'বাবা সুবোধ, ডান চোখটা দিয়ে তো দেখি না।' ওরা টিভি দেখছিল, জামাই বললো, ও কিছু না, আপনার গ্য াসের ট্রাবল আছে, ওই থেকে হচ্ছে, ডাইজিন একটু বেশি করে খান ঠিক হয়ে যাবে। ঠিক অবশ্যই হয়নি তা না হলে শেষমেশ রেটিন াল ভেন অক্লুসন নিয়ে মাদ্রাজে আসবেন কেন। মনে মনে ভাবলাম ভদ্রলোকের জামাই ভাগ্য সত্যিই ঈর্ষণীয়।

পেশেন্টদের প্রা অনেকরকম হয়। তা নিয়ে ডাক্তারদের 'পেশেন্স' হারানোর অর্থ হয় না। আমি সব সময় উত্তর দেবার চেষ্টা করি। সঠিকভাবে বললে প্রাণপণ চেষ্টা করি। যেমন একজন শু করেছিলেন যেমন প্রায় সবাই করে। 'আচ্ছা, আমি কি টিভি দেখতে পারবে া? হ্যাঁ।' কালার টিভি? ---হ্যাঁ। খাওয়া - দাওয়া? - নর্মাল। টক-ঝাল?--দিলে খাবেন। না, বারণ নেই পারেন। একবার যার ক্যাট ারাক্ট অপারেশন করবার পর থেকেই বেশ ঝামেলা হচ্ছিল বলে আমাদের কাছ এসেছিলেন, ওনাকে জিগ্যেস করেছিলাম, অপ ারেশনের পর ডাক্তারকে দেখিয়েছিলেন ডাক্তারবাবু পোষ্ট অপারেটিভ চেক্-আপের কোনো রিপোর্ট দিয়েছিলেন? বললেন, নেই। ড াক্তারবাবু অপারেশন করার দুদিন পরে সুইসাইড্ করেন। আমার বুকের ভিতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। উনি অবশ্য আমাকে ধাতস্থ করে বলেছিলেন,না, না, আমার চোখের অপারেশনের জন্য নয়। বউ-এর সঙ্গে অনেকদিন ঝামেলা চলছিল, মনের দুঃখে---

একবার আঠারো কুড়ি বছরের একটি ছেলে এসেছিল, বহরমপুরের কাছ থেকে। ওর বাঁ- চোখটায় একটা ক্লিনিক ইনফেকশন হয়েছিল। পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখি ডান চোখটাতে আলোই দেখে না। শুকিয়ে ছোটো হয়ে আছে। স্বাভাবিক বুদ্ধিতেই জিগ্যেস করেছিলাম, ডান চোখটায় কি হয়েছিল? ছেলেটা বলেছিল, ডানটার কথা ছেড়ে দিন স্যার, ছেটোবেলায় কি একটা অসুখ হয়েছিল, বাবা জানে, ছোটোবেলা থেকেই দেখি না ওটায়। ওটা নিয়ে ভাববেন না। ওটা এখন সিলেবাসের বাইরে। ভাবলাম জিগ্যেস করি, আমার না আপনার ?

ডাক্তারকে প্রা করা বা হিস্ট্রি দেওয়াতেই নয়, বাঙালিরা অনেক ব্যাপারেই করিৎকর্মা ও উদার। বিশেষ করে বন্ধুবাৎসল্যে। একজনের কথা মনে আছে। উনি ওনার বন্ধুর ছেলের জন্য এস টি ডি ফোন করেছিলেন শান্তিনিকেতন থেকে প্রশ্নোত্তরটা হুবহু তুলে ধরছি। ওপ্রান্ত থেকে জিজ্ঞাসা, আপনি তো ডাক্তার বিশ্বাস? বললাম, হ্যাঁ বলুন। কেমনআছেন? আছি একরকম। কি ব্যাপার বলুন। এস টি ডি ফোনে ভাল, খারাপ বলে সময় নষ্ট করার অর্থ হয় না। আমাকে চিনবেন না জানি, কাজের কথাটা বলি, আমার বন্ধুর ব াচ্চাটার না একটা বিচ্ছিরি এ্যাকসিডেন্ট চোখে। কি? কালকে কালীপুজোর তুবড়ী পোড়াতে গিয়ে চোখের ভিতর তুবড়িটা ... ডাক্ত ার দেখিয়েছেন? হ্যাঁ এখানকার। কি বলেছেন? এখ্খুনি মাদ্রাজে নিয়ে যান---তাই ভাবছিলাম...। তাহলে ইমিডিয়েটলি আসতে বলুন, যে কোনো সময় এমারজেন্সিতে দেখাতে পারেন। আপনি থাকবেন তো ? আমার থাকার দরকার হবে না এমারজেন্সি কেস দেখে দেবে যেই থাকবে। না আপনি থাকলে সুবিধা হয় । দু-একদিনের মধ্যে পাঠাচ্ছি। আপনি ছুটিতে যাচ্ছেন না তো। মনো সিলেবলে উত্তর দিলাম না। জানেন তো গতবার একজনকে আপনার নাম করে পাঠিয়েছিলাম, আপনি ছুটিতে ছিলেন। মনে মনে বললাম, মা, আমাকে ধৈর্য দাও, মা। আচ্ছা ওদেরকে স্টেশন থেকে কি করে যেতে বলবো? অটো নিতে বলবেন। ট্যাক্সি? মনে মনে আবার বললাম, ভগবান! আচ্ছা ওখানে গিয়ে? বেঁকলে তেঁতুলগাছ পড়বে, তারপর সামনে গেট এমারজেন্সি। আপনাকে অশেষ...। আপনি আছেন তো? ভাবলাম বলি আমি সারাজীবন আপনার বন্ধুর ছেলের অপেক্ষায়। বলিনি। শুধু বলেছিলাম, আম ার একটা ছোট্ট প্রা আছে। এতক্ষণ এস টি ডি তে কথা বললেন, আপনার তো অনেক বিল উঠে গেল ---এতটা খরচ করলেন। উনি একটু অপ্রস্তুত হয়ে গিয়ে বললেন আরে না, না, আমি তো এখানকার টেলিফোন এক্সচেঞ্জে কাজ করি। বন্ধুর ছেলের জন্য এটুকু তে া...।

আমার অভিজ্ঞতার ঝুলিতে অম্লতা নয়, আছে কিছু অমল - মধুর -স্মৃতিও। আসলে এইসব আছে বলেই জীবনকে মহার্ঘ বলে মনে

হয়। দুটো ঘটনা বলি। এই দুটো স্মৃতিই আমাকে উজ্জীবিত করে। বারবার মনে করিয়ে দেয় কবিগুর কথা, মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো পাপ। হুগলির বেগমপুর থেকে এসেছিলেন ভদ্রলোক। বেগমপুর গ্রামের প্রাইমারি হেলথ সেন্টারের ডাক্তার আমার মেডিক্যাল কলেজতুতো দাদা চিঠি দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। আমি কিছুটা সাহায্যও করেছিলাম। ভুলেও গিয়েছিলাম ব্যাপারটা। টানা তিনঘন্টা অপেক্ষার পর পেশেন্ট শেষ করে ওয়ার্ডের দিকে দ্রুত যাবার পথে ছুটন্ত আমাকে দাঁড় করিয়ে বলেছিলেন, আপনাকে একটু তেল দেবো। থমকে দাঁড়িয়েছিলাম। তেল না, খাঁটি সরষের তেল, আপনাকে দেবো। ভাবলাম লোকটা পাগল না পেট খারাপ? ন, আমার নিজের বাড়িতে ঘানিতে করি তো। ভাল, ঝাঁঝ আছে। মুড়ি দিয়ে খাবেন ভাল লাগবে, এখানে মুড়ি পাওয়া যায়? ভদ্রলোক চিটচিটে চটের ব্যাগ থেকে গনেশমার্কা টিনের কৌটোতে কেজি দুয়েক সরষের তেল ভাল করে বাঁধাছাদা অবস্থায় দিয়েছিলেন। হাসপাতালের নিয়ম অনুযায়ী জেনারেল ম্যানেজারের কাছে ওই তেলের টিন নিয়ে দামটা এ্যাসেস করে হাসপাতালের এমপ্লয়িজ কমন ওয়েলফেয়ারে টাকটা জমা দিয়ে ওইতেল দিয়ে মুড়ি-পেঁয়াজ মখে সত্যিই খেয়েছিলামউপভোগ করে। তবে জনান্তিকে জানিয়ে রাখি আমাদের ম্যানেজার ওই সরষের তেলের ঝাঁঝালো গন্ধের চোটে একমিনিট যা দাম এ্যাসেস করেছিলেন তা নিতান্তই কম ছিল। তবে সরল প্রাণের অনাবিল স্নিগ্ধতায় মাখা এই সরষের তেলের মূল্যকে কোনো পার্থিব দাঁড়িপাল্লায় হিসেবে রাখা যে কতটা মূর্খতা তা আমি জানি।

দ্বিতীয়টি একটি চিঠি। যা আমি জীবনের অন্যতম মূল্যবান চিঠি (অবশ্যই স্ত্রীর চিঠি বাদ দিয়ে) বলে মনে করি। টিঠিটা আমাকে লেখা নয়। চিঠিটা লিখেছিলেন মুলহুডা গ্রামে হেড মাস্টার তার বন্ধু নুর মহম্মদ কে। নুর মহম্মদ চোখের জটিল অসুখে ভোগা তার ছোটে মেয়ের এবং এই চিঠি নিয়ে আমার কাছ এসেছিলেন। চিঠিটানা এডিট করেই তুলে ধরছি। প্রিয় নুর মহম্মদ, আমার দোওয়া ও ভালোবাসা নিবে। অদ্য সকালে ঝুনকার হেডমাস্টারের কাছে শমকর নেত্রালয় হাসপাতালে আমাদের দেশের মানে নদীয়া জেলার একজন ডাক্তার থাকেন তার নামপাই। ডাঃ জ্যোর্তিময় বিশ্বাস। উনি ওখানে ডাক্তার জে বি নামে থাকেন। ওনাকে আমার কথা বলে বলবে, নুলহুডা গ্রামের হেডমাস্টার সাহেব তোমার মেয়েটারে ভালো করে দেখে দিতে বলেছেন। উনি সব ব্যবস্থা করবেন। বেশী কি লিখব। বিশেষ খবর আজকে আমাদের হারানো ছাগলটা পাওয়া গেছে। পত্রপাঠ কি হোলো জানাবে। ---ইতি---আশীর্বাদক আবু বাশার। আবু বাশার সাহেবকে আমি চিনি না। তাতে কিছু যায় আসে না। চিঠিটাতে দুটো গুত্বপূর্ণ কথা ছিল। একটি অবশ্যই তাঁর দেশের ছেলে আমি, যার ওপর একটা গ্রামের হেডমাস্টার হিসেবে তাঁর অধিকার আছে বৈকি। দ্বিতীয়টি হারানো ছাগল। আমি গ্রামের ছেলে। আমাকে কাউকে বলে দিতে হবে না, গ্রামের লোক গ্রাম ছেড়ে, দেশ ছেড়ে অন্য জায়গায় গেলে দেশ গাঁয়ের লোক কেউ আছে জানলে কতটা আশ্বস্ত হন। আর ঠিক তেমনই গুত্বপূর্ণ হারানো ছাগলটা ফিরে পাওয়া। হ্যাঁ, আমি নুর মহম্মদকে যথাসাধ্য সাহায্য করেছিলাম। তবে ওই চিঠিটাকে হস্তগত করেছি। কারণ সরলতার অমল স্নিগ্ধতায় লেখা নুলহুডাগ্রামের হেডমাস্টারের ওই চিঠিটা ডাক্তার হিসেবে এক পরম স্বীকৃতি। তা তো আমি আপনি সবাই মানবেন।